ভালবাসা।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত

সতোখালী নিবাসী

শ্রীকালিপ্রসন্ন সান্যাল

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

শোভাবাজার ৫১ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেনের

হরিতোষিণী যন্ত্রে

শ্রীনফরচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯০

ভূমিকা

মূকের বক্তৃতা ইচ্ছা, পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন বাঞ্ছা, বামনের চন্দ্র ধরণাভিলাষ এবং অন্ধের পথ প্রদর্শক হইবার চেষ্টা যেমন হাস্যস্পদ, মাদৃশ ব্যক্তির গ্রন্থ লেখার উদ্যমও তদ্রূপ হাস্যস্পদ। কিন্তু মনুষ্যের কতগুলি মনোভাব আছে যাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা হয়, আমি সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ভালবাসাকে জনসমাজে প্রণয়ন করিলাম, এ স্বভাবতঃ কুরূপা এবং অলঙ্কার বিহীনা। কিন্তু কেহ একমাত্রও ইহার সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র অবয়বটী অবলোকন করিলে, আমার শ্রম সফল হইবে।

সতোখালী
১২৮৯।১০ চৈত্র } শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন দেব রায়

জমিদার মহাশয় সমীপেষু।

ছান্দড়া যশোহর।

মহাশয়!

আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি স্নেহ করিয়া থাকেন এবং আমরা ক খ ও A. B. C. যাহা শিখিয়াছি সে কেবল মহাশয়ের বিদ্যা উৎসাহ ও দেশ হিতৈষীতার গুণেই বলিতে হইবে। ফলতঃ স্বদেশ হিতৈষীতা, নানাবিধ বিদ্যার চর্চ্চা, অতুরের প্রতিপালন, চিকিৎসা, ঔষধদান, প্রভৃতি যাবদীয় সদ্‌গুণই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহাশয়ের নিকট আমি চির উপকৃত পাশে বন্দী আছি।

অদ্য ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই ভালবাসা আপনাকে উপহার দিলাম।

ভবাদৃশ বিজ্ঞতম পণ্ডিতের সম্মুখে যদিও এই অলঙ্কার বিহীনা কুরূপাকে লইতে লজ্জা হয়, কিন্তু, আমি নিতান্ত দরিদ্র আমার নিকট রত্ন-রাজী নাই, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও ইহাকে ভুষিতা করিতে পারিলাম না; হেম, হীরক প্রভৃতি মণি মাণিক্য থাকিলে ইহাকে সাজাইতে ক্রুটী করিতাম না, ভিক্ষা করিলেই বা কে আমাকে দিবে? মহাত্মা বাসুদেব যেমন দরিদ্র বিদুরের দত্ত খুদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ভরসা করি মহাশয়ের উদা-রতা গুণে এই দরিদ্রের দত্ত উপহারটী যৎসামান্য হইলেও গ্রহণ করিবেন।

সাহেবগঞ্জ
বর্দ্ধমান
১২৯০।১৫ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

ভালবাসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা।

ভালবাসা কাহাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে, সাধারণতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্তিকে ভালবাসা বলা যাইতে পারে। ইহা একরূপ নহে এবং এক কারণেও উপস্থিত হয় না। নানা কারণে নানা রূপ ভালবাসার উদয় হয়, এটী কেবল লৌকিক নহে, ঈশ্বরদত্ত গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক স্থানে দীর্ঘকাল বাস হইলে আসঙ্গলিপ্সা—আসঙ্গলিপ্সা হইতে ভালবাসার উদয় হয়। একবার ভালবাসাকে অন্তরে স্থান দিলে, ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং শেষে ইহার

এতদূর প্রাদুর্ভাব হয় যে, ভালবাসা ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত আত্মসুখ, সচ্ছন্দতা, শরীর এবং জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

জগতে প্রকৃত ভালবাসা অতি বিরল; তবে বিরল বলিয়া যে এককালে নাই, তাহা নহে। যদি মনুষ্য মাত্রে মনুষ্যকে ভালবাসিত, তবে মনুষ্য-কর্ত্তৃক অনিষ্ট জগত হইতে একেবারে উচ্ছেদ হইত।

এই ভালবাসাকে আর্য্য কবিগণ সংসারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং বেদব্যাস ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ ইহাকেই মায়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ জগৎ-স্রষ্টার এমন কৌশল যে ঐ মায়ার উচ্ছেদ করা যায় না। মনুষ্যগণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল ইহার প্রভাবেই উন্নতি উন্নতি করিয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু মৃত্যু যে অবশ্য-ম্ভাবী, তাহার দিকে দৃক্‌পাতও নাই; কিসে সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইবে, কিসে পুত্র কলত্র সুখী হইবে, কি উপায়ে বড়লোক হইব, সর্ব্বদাই এই চিন্তা; কিন্তু এই চিন্তার শেষ না হইতে হইতেই

যে কাল সাংঘাতিক অস্ত্র লইয়া ক্রমে অগ্রসর হই-তেছে এবং কোন সময়ে মস্তকে পাতিত করিবে, তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই। মনুষ্য কেন? জগতে যাবদীয় পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গাদি প্রাণীমাত্রই জগদীশ্বরের এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে। পক্ষী-গণ স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর থাকিয়াও আহারীয় দ্রব্য চঞ্চু দ্বারা শাবকের জন্য বহন করিতেছে, অথচ ঐ শাবক উড্ডনশীল হইলে, জীবনে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে কি না সন্দেহ, তত্রাচ ভালাবাসার এতদূর মহিমা, যে নিজে আহারাভাবে কষ্ট পাই-য়াও শাবককে আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া দিবে।

এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিলে অপর ব্যক্তিকেও পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিকে ভাল-বাসিতে হইবে। অর্থাৎ আমি যদি অকৃত্রিমরূপে তোমাকে ভালবাসি. তবে তুমি আমাকে কখনই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। ইহার কারণ কি? এটী সেই সর্ব্বশক্তিমান জগৎ-কর্ত্তার প্রেরিত গুণ, ইহার দ্বারা জগৎ-সংসার দৃঢ়রূপে বন্ধন রহিয়াছে, বিশেষতঃ আমার ও তোমার হৃদয়

এক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, জগতের পদার্থ মাত্রেরই আকর্ষণ শক্তি আছে, অতএব যদি আমার হৃদয় তোমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল, তবে তোমার হৃদয়ও আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি লিখিব আর কি লিখিতেছি!

এই সংসারে একা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি একাই এই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, জগতের পদার্থের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি কাহার? আমারি বা কে? পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, কলত্র, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, মিত্র কেহই সেই শেষ দিনে সঙ্গী হইবে না, তবে তাহাদের জন্য এত চিন্তা কেন? তাহাদের সুখ বর্দ্ধনের জন্য এত চেষ্টা কেন? তাহাদের শারীরিক অসুখ হইলেই বা এত মনোবেদনা কেন? আবার কাহার অভাব হইলেই বা জীবনে অপ্রয়োজন বোধ হয় কেন? এটী সেই ঈশ্বরদত্ত ভালবাসার গুণ, এই গুণেই জগতের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে; লোকে ইহা জানিতে পারিয়াও পারে না, যথা—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি,
দেবী ভগবতী হি সা,

বলাদাকৃষ্য মোহায়
মহামায়া প্রযচ্ছতি।" চণ্ডী

জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিয়মানুসারে মায়ারূপ মোহ অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় পথিকের ন্যায় জগতে প্রাণীগণ স্ত্রী পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির ভালবাসা রূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমাদের বুদ্ধি চালনার কথঞ্চিৎ শক্তি পাইবার পূর্ব্বেই ভালবাসা-রূপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই, এবং আমরণ কাল সেই নিয়মাধীন থাকিয়া অদৃষ্টানুসারে কেহ পরম সুখ, কেহবা পরম দুঃখ ভোগ করিতেছি।

বোধ হয় অনেকে উপহাস করিতে পারেন যে, এক কার্য্যে পৃথক ফল অসম্ভব, কারণ, যদি দুই ব্যক্তি এক সময়ে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ করিয়া চাউল দিয়া ভাত রন্ধনের উদ্যোগ করে, তবে কাহার অদৃষ্টগুণে ভাত, আবার কাহার অদৃষ্ট ক্রমে কাঁকর হইতে পারে না, ফলতঃ যদিও প্রথমতঃ এই ঘটনাটী অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিবেন, কারণ

সকলেই এই সংসারে আসিয়াছেন, কিন্তু সকলের জীবন কি এক মত যাপন হয় ? কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ আনন্দে আবার কেহবা রোদন করিতে করিতে দিন যাপন করিতেছেন। অট্টালিকাতে বাস করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলেই যে সুখী হয়, আমি তাহা তাহা স্বীকার করি না এবং পর্ণ-কুটীরে বাস করিয়া কদান্ন আহার করিলেই যে দুঃখী তাহাও নহে, যাহার মনে সুখ আছে, সে বৃক্ষতলে বাস করিয়া দুই দিবসান্তে শাক সিদ্ধ খাইলেও সুখী ; যাহার মনে দুঃখ, সে স্বর্ণ অট্টা-লিকাতে বাস করিয়া স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ উপকরণ যুক্ত উপাদেয় পরমান্ন ভোজন করিলেও দুঃখী। ইহারই বা কারণ কি ? কারণ ভালবাসা!! যে দ্রব্য যত পরিমাণ সুখদায়ক, আবার সেই দ্রব্য তাহার সহস্র গুণ দুঃখদায়ক।

অনেকে ভালবাসাকে দুঃখের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু আমি বলি ভালবাসা সুখ ও দুঃখ উভয়েরই একমাত্র গূঢ় কারণ, যেহেতু ভালবাসা ব্যক্তির বিচ্ছেদ মাত্রই নানামত মন কষ্ট উপস্থিত হয়, যদিও দুই দিন

পরে হউক, দশ দিন পরে হউক, দশ বর্ষ পরে হউক, পুনর্ম্মিলনের সম্ভব থাকে, তত্রাচ সেই প্রাণাধিক বন্ধু বা পুত্রের অথবা পত্নীর আশু বিচ্ছেদে কত যন্ত্রণা হয়, আর যদি সেই প্রাণ হইতে প্রিয়তর ব্যক্তি চিরদিনের মত এই সংসার ত্যাগ করে, তবে কত মনবেদনা ও কত দুঃখ উপস্থিত হয়!!! সেই দুঃখ চিরস্থায়ী। অট্টালিকাতেই বাস কর, আর পলান্নই ভোজন কর, মনের কষ্ট কিছুতেই দূর হয় না, বরং ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, কোন উপায়েই শান্তিলাভ হয় না, তাই বলি ভালবাসা সুখ ও দুঃখের এক মাত্র কারণ।

জগতের নিয়মানুযায়ী অনেক মনুষ্যই ত দিন দিন কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, কিন্তু কৈ সকলের অভাবে ত মনবেদনা হয় না?—সকলের অভাবে ত হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? আবার একজনের জন্য জগৎ শূন্য বোধ হয়, জীবনে কোন উদ্দেশ্য থাকে না; সেই ভালবাসা ব্যক্তি;—তাই বলি ভালবাসা সুখ ও দুঃখের এক মাত্র কারণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই জগতে কেহ কাহার নহে, এমন কি "কায়া প্রাণে ন সম্বন্ধ" একা আসি-

য়াছি একাই যাইব, তবে পরের জন্য এত কষ্ট কেন?—এত চিন্তা কেন?—এত দীনতা কেন? ভালবাসা! ভালবাসা!! কেবল ভালবাসা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া এত কষ্ট ভোগ! এত দুঃখ ভোগ! এত যাতনা ভোগ!!! তাই বলি ভালবাসা সুখ ও দুঃখের একমাত্র কারণ।

কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে সুখ অথবা দুঃখ দুয়ের এক হইবে, তবে জানিয়া শুনিয়া এমত কার্য্য করি কেন? যাহার ফলের স্থির নাই, অমৃতও হইতে পারে, গরলও হইতে পারে, তবে এরূপ অনিশ্চিত ফলবিশিষ্ট বৃক্ষ রোপণ করি কেন? ইহার উত্তর এই যে জগতে কটী কার্য্যের ফল নিশ্চয় আছে? বস্তুতঃ কোন কার্য্যেরই ফল নিশ্চয় নাই, পরিণামে কি ফল হইবে, তাহা পূর্ব্বে কে জানিতে পারে? সুফল হইবে মনে করিয়াই কার্য্যারব্ধ ও বৃক্ষ রোপণ করে, অদৃষ্টাধীনে ফলাফল পরিণামে ফলে, মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কিছুই নহে; ঐশ্বরিক মায়া ভালবাসাতে মানবগণ স্বভাবসিদ্ধ আবদ্ধ হয় এবং সেই শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অদৃষ্টানুসারে কেহ চির-কাল সুখ ভোগ, কেহ বা আমরণ কাল ভালবাসা

ভালবাসা।

রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে, তাই বলি ভালবাসা সুখ ও দুঃখের একমাত্র কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট।

বোধ হয় এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে অদৃষ্টবাদী লোক অতি অল্প আছে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিশেষতঃ আজ কাল গৌরাঙ্গ ম্লেচ্ছরাজের বিজ্ঞানবিশিষ্ট ম্লেচ্ছ ইংরাজি ভাষা শিক্ষা গুণে অদৃষ্টকে অদৃষ্টের ফলে তাঁহার চির বাসস্থান ভারত ভূমিকে ত্যাগ করিয়া জারম্যান প্রভৃতি আধুনিক রাজ্যে উপনিবাস করিতে হইয়াছে।

অদৃষ্ট কাহাকে বলে? অদৃষ্ট শব্দার্থ যাহা দেখা যায় না এবং অনেকে মনুষ্যগণের প্রাক্তন্যে যাহা যাহা ঘটিবে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সেই ঘটনা সমূহকেও অদৃষ্ট কহেন।

রাম রজনী প্রভাতে রাজা হইবেন, কিন্তু অদৃষ্ট প্রভাবে বনে গমন হইল; রাম কি পুরুষত্বদ্বারা বন গমন নিবারণ করিতে পারিতেন? পারিলেও তাঁহার সে প্রবৃত্তি হয় নাই, কেন হয় নাই? রাম নিবীর্য্য

ছিলেন না এবং তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেও অনেক লোক প্রস্তুত ছিল, বিশেষতঃ ভ্রাতা বীর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ও তাঁহাকে এজন্য অনেক উত্তেজনা করিয়াছিলেন, তবে কেন তাঁহার বন যাত্রা নিবারণ ইচ্ছা হইল না?—অদৃষ্টের ফল! বিধিলিপি কদাচই খণ্ডন হইবার নহে, সুতরাং রামের বন মনে অনিচ্ছা না হইয়া বরং ইচ্ছাই হইয়াছিল।

যদি অদৃষ্ট ঈশ্বর-লিপিই হইল, তবে ঈশ্বর কি পক্ষপাতী, যে কাহাকে চিরসুখী ও কাহাকে চির-দুঃখী করিবেন? তিনি জগৎকর্ত্তা, তাঁহার নিকট প্রাণীমাত্রেই তুল্য, তবে তিনি কি জন্য কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী করিবেন? তিনি জগৎস্রষ্টা, তাঁহার নিকট অবিচার নাই—তবে কেন এরূপ বিচারের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই? এ কথার উত্তর এই যে ঈশ্বর আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি যাব-তীয় ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, বুদ্ধি নহিলে ইহা-দের চালনা হয় না, সেই বুদ্ধি ও মন এবং হিতা-হিত বিবেচনা শক্তিও অপর্য্যাপ্তরূপে দিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন, আমরা বুদ্ধিদ্বারা কোন্‌টী সৎ, কোন্‌টী অসৎ কার্য্য তাহা

নির্ণয় করিতে পারি, সুতরাং যে যেমন কার্য্য করি, ফল ভোগও সেই মত করি।

যদি কোন উদ্যানে একটী অম্র বৃক্ষ রোপণ করা যায়, তবে সেই বৃক্ষে অম্র ব্যতীত কাঁঠাল পাইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, অথবা যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা মধ্যে হস্ত দিলে, হস্ত দগ্ধ ব্যতীত শীতল হইবার আশা থাকে না, সেই রূপ যে সময়ে যে অবস্থায় যে কর্ম্ম করা যায়, সেই সময়ে সেই অবস্থায় সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল জীব মাত্রকেই ভোগ করিতে হইতেছে; যে সৎকার্য্য করিয়াছে, সে সুখ, যে অসৎ কার্য্য করিয়াছে, সে দুঃখ ভোগ করিতেছে।

কিন্তু অনেক পাঠক কর্ম্ম ফল স্বীকার করা দুরস্তাং আদৌ পূর্ব্ব জন্মই স্বীকার করিবেন না; না করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার অনুরোধে Uclid's axiom ন্যায় স্বীকার করিয়া লন। স্বীকার করিলেও পূর্ব্ব কথায় দোষ পড়িতেছে। কার্য্যের প্রবৃত্তি কোথা হইতে হয়? ঈশ্বরকেই প্রবৃত্তি দাতা বলিতে হইবে, তবে তিনি

কাহাকে সৎ প্রবৃত্তি, আবার কাহাকে বা অসৎ প্রবৃত্তি দিয়াছেন কেন? মানবগণ যন্ত্রস্বরূপ, ঈশ্বর যন্ত্রী; তিনি যখন যে দিকে যে ভাবে যেরূপে চালান, মনুষ্যগণ সেই দিকে সেই ভাবে সেইরূপে চলে। তিনি সর্ব্বপ্রকারের সুপথ ও কুপথ দর্শক, যদি তিনি আমাকে সুপথে চালাইতেন ও সৎ প্রবৃত্তি দিতেন, তবে আমিও সৎকার্য্য করিতে পারিতাম। এস্থলে হয় ঈশ্বরের পক্ষপাতীত্ব স্বীকার, অথবা অদৃষ্ট অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি দুয়ের একটীকেও স্বীকার করি না। সুখ দুঃখ জগতে নাই, কেবল মনের ভাব মাত্র। কেহবা স্বর্ণ অট্টালিকাতে বাস করিয়াও সুখী নহে, কেহবা বৃক্ষমূলে বাস করিয়াও সুখী; কেহবা নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া মণি, মাণিক্য, হীরক প্রভৃতি রত্নে ভূষিত হইয়াও মনের দুঃখে রোদন করিতেছে, কেহবা শতধা ছিন্ন মলিন অতি জীর্ণ কৌপিণ মাত্র পরিধান করিয়াও মনের আনন্দে হাস্য করিতেছে। এইরূপ জগতে সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য কিছুই নাই, কেবল মনের ভাব মাত্র। বিশেষতঃ যে তর্কের মীমাংসা তর্ক,

ন্যায়, দর্শন, চতুর্ব্বেদ, শাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে হয় নাই, আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিদ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার মীমাংসা অসম্ভব, তবে সংসারে থাকিতে হইলেই অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল মানিতে হইবে। কিন্তু আমি কি লিখিব, আর কি লিখিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসার।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, পত্নী প্রভৃতি একত্র বাস করিয়া পরস্পরের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে সংসার কহে।

সংসার সুখ ও দুঃখের ক্রীড়া স্থান। অনেক ধনাঢ্য কৃতবিদ্য ইয়ং-বেঙ্গল বাবুরা মনে করিতে পারেন, সংসারে আবার দুঃখ কিসের? যে স্থানে পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, পত্নীর পরম পবিত্র প্রেম, পুত্র কন্যাগণের আন্তরিক ভক্তি, কুটুম্বগণের আদর, বয়স্যগণের সৌহার্দ্দ্য এবং প্রতিবাসীগণের আত্মীয়তা সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছে, সে স্থানে আবার কিসের দুঃখ?

এ স্থলে আমি একটী গল্প বলিতেছি, পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাচালতা মাপ করিবেন।

কোন এক অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রকে এই শ্লো-কটী শিক্ষা দিতেছিলেন যে "সংসারবিষ বৃক্ষস্য, দ্বে অত্র রসবৎফলে, কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ, সঙ্গম

স্বজনৈসহ” অধ্যাপক মহাশয়ের শ্লোকটী পাঠ শেষ হইতে না হইতেই, ছাত্র ভায়া মহা ক্রোধান্ধ হইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের সম্মুখ হইতে লম্ফদ্বারা দূরে গিয়া বাহাত্তুরে, ছন্নছাড়া প্রভৃতি কতকগুলি সুমিষ্ট শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক গুরুকে অভিবাদন করতঃ পুস্তক বান্ধিয়া চলিলেন, সেটী টোলের প্রধান ছাত্র; অধ্যাপক মহাশয়ও কেবল পাঠ সমাপন করিয়া নূতন টোল করিয়াছেন, প্রধান ছাত্রটী গেলে, ক্রমে কয়েকটীই যাইবে, টোল চলিবে না, সুতরাং পত্রী হইবারও নানামত গোল-যোগ হইবার সম্ভব, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, ছা-ত্রকে নানাবিধ মিষ্টালাপে সন্তোষ করিয়া, অবশেষে কহিলেন, “বাপুহে! শ্লোকটা পাঠ হইতে না হই-তেই যে ক্রোধান্ধ হইয়া যাইতেছিলে?” ছাত্র-ভায়া উত্তর করিলেন, “মহাশয় যখন এই সোণার সংসারকে বিষবৃক্ষের সহিত উপমা দিতেছেন, তখন আপনার উপদেশ গ্রহণ করিলে আমিও নিশ্চয় আ-পনার ন্যায় অপদার্থ হইব।” অধ্যাপক দেখিলেন অনু-পায়! তখন তিনি ঐ শ্লোক বাদ দিয়া অপরাপর বিষয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাই যদি ছাত্র

স্বভাববিশিষ্ট কোন পাঠক থাকেন, তবে পুঁথি না বাঁধিয়া একটু চিন্তা করিলেই সংসারকে সুখ ও দুঃখের ক্রীড়াস্থান বলিয়া জানিতে পারিবেন। আর যদি চিন্তা করিতেও আলস্য বোধ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানির শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। কিন্তু আমি কি লিখিব আর কি লিখিতেছি।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র পিতা মাতা পূর্ব্বোল্লিখিত ঐশ্বরিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিতে থাকেন এবং সেই ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া নানা কষ্টকেও সুখ বোধে নবজাত সন্তানকে লালন পালন করেন। সন্তান রূপবান হউক, আর রূপহীনই হউক, অন্ধ অথবা খঞ্জই হউক, পিতা মাতার স্নেহের হ্রাস হইবে না। কিসে সন্তান জীবিত থাকিবে, যাহাতে সে ক্ষুধায় কষ্ট না পায়, সর্ব্বদাই এই চিন্তা; এইরূপ পিতৃ মাতৃ স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বাক্ ও চলৎশক্তি প্রাপ্ত হয়—বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত মাত্র, পিতা পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার নিমিত্ত নানা মত চেষ্টা ও উপায় করেন। ক্রমে সন্তান শিক্ষা ও যৌবন প্রাপ্ত হন এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইবার প্রাঙ্মুখে উপস্থিত হন।

দূর হইতে সংসারের সৌন্দর্য্য এত উৎকৃষ্ট বোধ হয়, যে মনুষ্য বিবেক শূন্য হইয়া সংসারে প্রবেশ হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, এদিকে বিবাহের উদ্যোগ হইতে থাকে।

বিবাহ শব্দটী এত সুমিষ্ট ও শ্রবণমধুর যে অশীতি বর্ষীয় পক্ককেশ, গলিত চর্ম্ম বৃদ্ধকেও বিবাহ দিব বলিলে আহ্লাদিত হয়।

আজ কাল সামাজিক নিয়মে বিবাহ নানা প্রকার হইয়া উঠিয়াছে।

কেহ কুলিনের ছেলে বিবাহের পাত্রীর অভাব নাই, এমন দশ বিশ স্থান হইতে পাত্রী পক্ষীয় ব্যক্তিগণ কুলীন মহাশয়ের পর্ণকুঠীর দ্বারে দণ্ডায়-মান হইয়া ঈশ্বর উপাসনা হইতেও অধিকতর ভক্তিভাবে পাত্র মহাশয়ের কর্ত্তাকে ভজনা করিতেছে। কর্ত্তা মহাশয় আধুনিক ব্রাহ্ম ভায়াদের ন্যায় চক্ষু মুদিত করিয়া নবাবি মেজাজে কুলের স্তোত্র শ্রবণ করিতেছেন এবং এক একবার পাত্র-কেই গুড়ুক সাজিতে আদেশ করিতেছেন। এইরূপ দুই এক বৎসর তপস্যার পর, যে উপাসকের ফুল, বিল্বপত্র ও নৈবিদ্যাদি উপকরণ মূল্যবান হইল,

অর্থাৎ যিনি দান, পণ, সোণা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে দিতে স্বীকার হইলেন) কর্ত্তার প্রসন্নতা তাহারই উপর হইল এবং ছেলের লেখা পড়া শিক্ষার কি মত হইবে, তাহার কথোপকথন চলিল।

কেহবা কষ্ট শ্রোত্রীয়, তাঁহার সংসারে প্রবেশ হইবার দ্বারেই সংসারে জীবন ধারণ রূপ উপায়কে বিসর্জ্জন করিয়া পরে সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।, তাঁহার বিবাহের ভারি অনুপায়! জানিলেন, নসীরাম চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর গর্ত্ত হইয়াছে, তৃষিত চাতকের ন্যায় সেই গর্ত্ত প্রতি দৃষ্টি রহিল, কি হয়! ঈশ্বর অনুগ্রহে কন্যাই হইয়াছে!! কন্যাটীর নাড়ী ছেদন হইতে না হইতেই পাড়ার দরবারে দুই এক ব্যক্তিকে দুই এক টাকা পাথেয় দিয়া, ঐ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পাঠাইলেন। ঘটক মহাশয়েরা বিবাহটী হইলে পাড়ায় এক ঘর ব্রাহ্মণ বজায় থাকে, সে অনুগ্রহে যতদূর না হ'ক পরিণামে পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কন্যার পিতৃভবনে ফাল্গুন মাসের মাছির ন্যায় গমনাগমন আরম্ভ করিলেন।

নসীরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বয়ক্রম আন্দাজ ৮০।৮৫ বৎসর হইবে। তিনি প্রথম বয়সে বড় সুরসিক পুরুষ ছিলেন, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অদ্যাপিও শরীরে দেদীপ্যমান আছে। এ বয়সে তাঁহার পত্নীর সহিত যে এক শয্যায় শয়ন না হইত এমত নয়।

স্ত্রী কন্যা প্রসব করাবধি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইয়ং-বেঙ্গল বাবুদের ন্যায় মেজাজও গরম হইতেছে। এদিকে ঘটকগণ গললগ্ন কৃতবাসে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্তোত্র আরম্ভ করিয়াছেন; চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই, কারণ তিনি কন্যার পিতা, এবার যো পাইয়াছেন, নিজের বিবাহের খরচের সুদ সমেত আদায় করিয়া কিঞ্চিৎ ডাক ফাজিল জমা করিতে হইবে, নহিলে, এ বৃদ্ধ বয়সে আর উপায় কি আছে? গিন্নীকেও কিছু গহনা দিবার ষ্টিমিট হইতেছিল—এই সকল গুরুতর যুক্তি স্থির হইলে ঘটকগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি কেহ বিষ্ণু, কেহ নারাণ, কেহবা সুগন্ধযুক্ত ফুলাল তৈল লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত।

কেহ বলিলেন "মহাশয়! ছেলেটী ভাল, বয়স অধিক নয়, এই কেবল শত্রুমুখে ছাই দে পঁয়তাল্লিশে পা দিয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ও আছে, তা আপনি যদি স্বীকার হন, তবে কথা পাড়া যায়।" কেহ বলিলেন "আমার এ ছেলে নিতান্ত বালক, লেখা পড়া করিতেছে, এবার বি, এ, পরীক্ষা দিবে, এই ছেলেতে কন্যাদান করিলে, কন্যাটী সুখে থাকিবে, আপনারও বৃদ্ধ বয়সে একটী অবলম্বন হইবে" ইত্যাদি প্রকারে যাহার পাত্রের যেরূপ রূপলাবণ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ধন, ঐশ্বর্য্য, তাহার শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে বর্ণনা হইতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ও সব বাজে কথা রাখ, কাজের কথা পাড়, পণ কত দিবা?" কেহ বলিলেন ২০০, কেহ ৫০০, কেহ ৭০০, কেহবা ১০০০, কিছুতেই নসীরামের মন উঠে না, পরে একজন বলিলেন "যদি আপনার করা কর্ত্তব্য হয়, তবে দুই এক শত জন্য আটক হইবে না" পরে ১৫০০৲ টাকা পণ সাব্যস্তে বিবাহ স্থির হইল। কন্যার বয়ক্রম তখন এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

ঘটক মহাশয় কৃতকার্য্য হইয়া শুভ প্রত্যাগমন

করিলেন, পাত্রকে আপন চাতুর্য্যের বাহাদুরিতে কৃতকার্য্য হইবার পরিচয় দিলেন এবং আগাম কিছু পুরস্কার পাইবার প্রার্থনা করিতেও বিস্মরণ হইলেন না।

বিবাহে পণই দেড় হাজার টাকা, তদ্ব্যতীত অন্যান্য খরচ চাই, তহবিলে মার কাট ১০।১৫ টাকা থাকিলে থাকিতে পারে, টাকার সংগ্রহ কি প্রকারে হইবে, তাহা ভাবিয়া পাত্রের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। এদিকে পাত্রীটী বেহাত হইলেও বিবাহের ভারি অনুপায়; কি করেন!—অবশেষে পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত যে কিছু নাখরাজ ও ব্রহ্মোত্তর ছিল, তাহা খোসকওলায় বিক্রী এবং সংসারে ব্যবহার্য্য তৈজসাদি বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ হইল এবং যাবজ্জীবন স্বীয় বন্ধন শৃঙ্খল তদ্দ্বারা খরিদ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

বঙ্গদেশ-চূড়ামণি, মহামান্য, পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের উপকারার্থে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত বহু দিবসাবধি বহুবিধ যত্ন ও নানামত চেষ্টা করিতেছেন; এ বিষয়ে যে তাঁহার ব্যয় না হইতেছে, এমত

নহে; ইহাতে তিনি যে পরিমাণ যত্ন করিতেছেন, ফলে ততদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তিনি যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত জন্য ব্যস্ত না হইয়া, কন্যা বিক্রয় অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত ৫।৬ বৎসরের বালিকার পরিণয়, কন্যার বাক্‌শক্তি হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ, এক পুরুষের ৬০।৭০টা বিবাহ, অথচ আবার কাহার আদৌ বিবাহ না হওয়া ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা রূপ পাপরাশি নিবারণ চেষ্টা করিতেন, তবে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। বস্তুতঃ উল্লিখিত কুপ্রথা গুলি দেশ হইতে দূর হইলে দেশের অনেক মঙ্গল হয় এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও সাধন হয়; যেহেতু আদৌ বিধবা হইবার কারণ না থাকিলে, বিধবা বিবাহের আবশ্যক কি? কিন্তু আমি কি লিখিব আর কি লিখিতেছি।

ঈশ্বর ইচ্ছায় উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পরিণয় হইল, অর্থাৎ সংসার আশ্রমে স্ত্রী রূপ রজ্জুতে দৃঢ় বন্ধন লইলেন।

অদৃষ্টক্রমে স্ত্রীর সহিত প্রকৃত প্রণয় জন্মিতেও

পারে, আবার না জন্মিতেও পারে; এই ভূমণ্ডলে শত সহস্র স্ত্রী পুরুষে কাটাকাটী করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে দেখা যাইতেছে, আবার ততোধিক স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখ অনুভব করিতেছে, সকলি অদৃষ্ট !!

স্ত্রী যাহার সহিত একত্রে চিরজীবন অতি-বাহিত করিতে হইবে, যাহার স্নেহ মাতৃস্নেহ বি-স্মরণ হইবে, যাহার শুশ্রুষায় শরীর আধি ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবে, যাহার প্রেমে সংসারে দৃঢ়-রূপে বন্দী থাকিতে হইবে, যে জীবনের প্রধান সহায়িনী তুল্য সুখ দুঃখভাগিনী এবং এই অসার সংসার আশ্রমে অবস্থিতির একমাত্র কারণ, সেই স্ত্রীর সহিত প্রকৃত ভালবাসা না জন্মিলে কত দুঃখ !!! সে দুঃখের সীমা নাই এবং কথায়ও প্রকাশ্য নহে !!! মনুষ্য চিরকাল সেই মনাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে; তাই বলি এই সংসার সুখ ও দুঃখের ক্রীড়া স্থান।

কালক্রমে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর প্রেম সঞ্চার হইতে থাকে এবং পরস্পরের অধিকৃত হইলে

প্রকৃত ভালবাসার আবির্ভাব হয়, তখন উভয়ে উভয়কে আত্ম সমর্পণ করেন এবং একের মঙ্গলের নিমিত্ত অন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

"সতীদাহ" ইহার নিত্য দৃষ্টান্ত স্থল; কিন্তু অনেকে বলিতে পারেন যে, সে কালে প্রকৃত প্রণয় জন্মিত, আর এ কালে জন্মে না কেন? জন্মিয়া থাকে, প্রণয় পদার্থটী নৈসর্গিক; তবে কৈ, লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক সতীদাহ নিবারক আইন প্রচার হওয়াবধি আর সতীদাহের নামমাত্রও ত শুনা যায় না? সত্য, যদিও রাজাজ্ঞা ভয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতি-চিতানলে দগ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু জীবিত অবস্থাতেই মরণকাল পর্য্যন্ত পতিবিরহ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে থাকে; চিতানল হইতে চিন্তানল সহস্র গুণ প্রবল, যথা—

"চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে,
চিন্তানামা" গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং,
চিন্তা দহতি সজীবকং॥

বিষ্ণুপুরাণ।

পতি-চিতানলে দগ্ধ হওয়া ক্ষণকাল মাত্র শারীরিক ক্লেশ, কিন্তু পতি অথবা পত্নী বিচ্ছেদে চিরকাল মনাগ্নিতে পুড়িতে হয়, সংসার শূন্য বোধ হয়, কার্য্যে আশক্তি বিহীন এবং জীবনে হতাদর হয়; তাই বলি বিরহানলে চিরকাল দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকাল শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়াই ভাল। কিন্তু আমি কি লিখিব আর কি লিখিতেছি।

তখন উভয়ের এক অবস্থা, এক মনবৃত্তি, এক উদ্দেশ্য ও এক প্রতিজ্ঞা হয় এবং দাম্পত্য প্রণয়কে স্বর্গ সুখ হইতেও শ্লাঘ্য জ্ঞানে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

আবার অদৃষ্টক্রমে স্ত্রী বিলাসিনী হইলে, স্বামীকে গহনার উত্তেজনায়একরূপ উন্মাদ গ্রস্ত হইতে হয়; আজ চিক চাই, আজ পাঁচনর চাই, আজ ন-নর চাই, এইরূপ প্রত্যহই নূতন নূতন গহনা চাই, অথচ স্বামীর কোন মঁতে উদর পূরণ করাই কঠিন; কি করেন, স্ত্রীকে প্রার্থনা মত গহনা দিতে পারেন না, সেও এক জ্বালা, আবার গৃহিনীর স্থূল-

লিত মিষ্ট ভর্ৎসনা, ক্রন্দন এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া, আবার জ্বালার উপর জ্বালা। স্বামীর সাংসারিক সুখ ভোগ দূরে থাক্, তাঁহার রাত্রে নিদ্রা হয় না, যে পর্য্যন্ত না মহানিদ্রায় অভিভূত হন, সে পর্য্যন্ত আর নিদ্রিত হইবার উপায় কি আছে? তাই বলি এই সংসার সুখ ও দুঃখের নিত্য ক্রীড়াস্থান।

কালক্রমে পত্নী সহবাসে পুত্র কন্যা জন্মে, তখন মনুষ্যগণ নানারূপ মনাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকেন। আজ বড় ছেলের মাথা বেদনা হইয়াছে, ডাক্তার ডাক; আজ ছোট কন্যার পেটের পীড়া হইয়াছে, কবিরাজ ডাক; আজ মধ্যম পুত্রের অসুখ হইয়াছে, ঔষধ আন, ইত্যাদি নানামত কষ্টেও দুশ্চিন্তায় শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকে, তাই বলি এই সংসার সুখ ও দুঃখের নিত্য ক্রীড়াস্থান।

জন্মগ্রহণ হইতে* উদ্বাহ কালপর্য্যন্ত মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে, বিবাহ হইবা মাত্র চতুষ্পদবিশিষ্ট পশু শ্রেণীতে গণ্য এবং সন্তান সন্ততি হইতে আরম্ভ হইলে ষষ্ঠ, অষ্টম, ও দশম পদ বিশিষ্ট ঊর্ণ

লাভ সংজ্ঞাতে গণিত হন এবং তাহাদের প্রতি-পালন জন্য ক্রমে জালপাতিতে আরম্ভ করেন, পরে আপন পাতিত জালে আপনি বদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাই বলি এই সংসার সুখ ও দুঃখের নিত্য ক্রীড়া স্থান। মনুষ্যগণ তাহাদের খেলনা, কখন দুঃখে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কখন বা সুখে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

যেমন কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি অগ্নির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইচ্ছাক্রমে তাহাতে প্রবেশ করে ও পুড়িয়া মরে, মনুষ্যও তদ্রূপ দূর হইতে সংসারের পরম রমণীয় শোভা অবলোকন করিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন এবং নানা রূপ মনাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকেন তবে মনুষ্যে ও পতঙ্গে প্রভেদ এই যে পতঙ্গ প্রবেশমাত্র প্রাণ বিসর্জ্জন করে, মনুষ্য মরণকাল পর্য্যন্ত নানামত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করে।

তবে কি সংসার দুঃখেই পরিপূর্ণ? সুখের লেশ মাত্রও কি নাই? নাই আমি বলিতেছি না, অবশ্য আছে; কিন্তু সাংসারিক সুখ দুঃখের তারতম্য

করিলে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অনেক পরিমাণে গুরুতর হইবে, কারণ (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) যে দ্রব্য যত পরিমাণ সুখদায়ক, আবার সেই দ্রব্য তাহার সহস্রগুণ দুঃখদায়ক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহ।

যদিও সাধারণ ঘর বাড়িকে গৃহ এবং যাহার গৃহ আছে তাহাকে গৃহী বলে, কিন্তু গৃহও গৃহী শব্দের ভাবার্থ পৃথক পৃথক, অর্থাৎ স্ত্রীকে গৃহ, এবং স্বামীকে গৃহী বলা যায়, যথা "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" স্বর্ণময় অট্টালিকা বিশিষ্ট গৃহ থাকে, ঐ গৃহে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আ-ত্মীয়বর্গ থাকুন, কিন্তু এক পত্নীর অভাব হইলেই গৃহশূন্য বলিবে। কেবল গৃহ শূন্য কেন? আমি বোধ করি জগৎশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সংসারে এমত লোক অতি অল্প আছে, যাহার সাংসারিক কার্য্যে কায়িক অথবা মানসিক পরিশ্রমে বিব্রত হইতে হয় না; সাধারণ মজুর হইতে স্বাধীন সম্রাট পর্য্যন্ত সকলকেই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তবে অনেক পেন্সনভোগী ও গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোটের শুদে জীবিকা নি-

র্ব্বাহকারিগণের ততটা নয় বটে, কিন্তু নয় বলিয়াই যে একেবারে নাই, তাহা নহে, তুলনায় অধিক আর অল্প।

চৈত্রমাসে প্রখর সূর্য্যতাপে প্রাতঃকাল হইতে ২॥০ প্রহর পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শরীর দগ্ধ হইলে, কাহার ভালবাসা রূপ সুশীতল বারি সিঞ্চনে শরীর স্নিগ্ধ হয়? ক্ষুধায় জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইলে কাহার আন্তরিক যত্নে সুতৃপ্তের সহিত ক্ষুধার শান্তি হয়? উৎসাহকে সম উৎসাহনীতা হয়? দুঃখকে তুল্য রূপ ভোগ করে? বিপদে কাহার মুখ অবলোকন করিলে শান্তিলাভ হয়? সুশ্রুষা করিতে কে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে? চিন্তায় কাহার সুধাময় সান্ত্বনা বাক্যে চিন্তার হ্রাস হয়? মুখ ম্লান দেখিলে কে দুঃখিতা হয়? আমায় প্রফুল্ল দেখিলেই বা কে আহ্লাদিত হয়? প্রমোদে কে প্রমোদিতা হইয়া প্রমোদের বৃদ্ধি করে? ব্যাধিগ্রস্ত হইলে কে আপন শরীর ও আহারাদিতে অনাদর করিয়া শুশ্রুষা ও প্রতিকারের চেষ্টা করে? এবং অভাব হইলেই বা কে চির দুঃখিনী হয়?

পত্নী—যে সম্বন্ধে পত্নী, সৌহার্দ্দ্যে ভ্রাতা, যত্ন

করিতে এবং আহার দিতে মাতা, আদর করিতে কুটম্বিনী, ভক্তিতে শিষ্য, উৎসবে বন্ধু বুদ্ধিদানে গুর্ব্বিনী, পরিচর্য্যা করিতে দাসী, যে দেহে জীবন, গৃহে লক্ষ্মী, বিসাদে হর্ষ, ক্রোধে শান্তি, রহস্যে বাঙ্‌ময়ী, ক্রীয়ায় বেশ্যা, ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী এবং এই অসার সংসারে একমাত্র বন্ধন রজ্জু, সেই জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা প্রিয়তমার জন্মের মত অভাব হইলে জগৎ শূন্য হইবে,তাহার আর আশ্চর্য্য কি!!

পিতা মাতা বল, ভাই ভগ্নি বল,স্ত্রীর ন্যায় বন্ধু জগতে দ্বিতীয় নাই, একাধারে এত ভাব, এত সম্বন্ধ, এত ভালবাসা পত্নী ব্যতীত আর কাহাকে সম্ভবে?

যাহাকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া সর্ব্বদা সম্বোধন করা যায়, তাহার বিয়োগ হইলে প্রাণ কিরূপ হয়, তাহা বাক্যে অথবা লেখনীতে প্রকাশ করা যায়না, যে ভুক্তভোগী, সেই বুঝিতে পারে নহিলে এযন্ত্রণা বোঝা যায় না। যথা—

যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম।
জেনে না জানিবে, বুঝে না বুঝিবে,
দেখে না দেখিবে কি দুঃখ মম॥

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আসি বিষে দংশে নাই যারে ॥

বোধ হয় এতক্ষণ বিবাহ সুলভ মহামান্য কুলীন সন্তানেরা আমার উপর রাগান্ধ হইয়া পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন। আর মনে মনে বলিতেছেন যে পিতা মাতা নয়, ভাই ভগ্নি নয়, খুড়া জেঠা নয়, যে চেষ্টা করিলে আর হইবে না, স্ত্রী একটা সাধারণ কথা, মনে করিলে এক রাত্রে ১০।১৫ গণ্ডা হইতে পারে,তাহার জন্য আবার এত আক্ষেপ এত খেদ ও এত মন বেদনা কেন ? একটা স্ত্রী শোকে নিতান্ত উন্মাদ হইয়া থাকিবে,নহিলে এরূপ প্রলাপ করিবে কেন ? কিন্তু আমি উন্মাদই হই, আর বিবেক হীনই হই, যে কুলীন মহাশয় পুস্তক ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন,আমি তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে অপ্রেমিক ও পশ্বাধম বলিব ; কারণ ঐশ্বরিক মায়া "ভালবাসা" পশুতেও আছে, কিন্তু তাঁহাতে নাই, সুতরাং তিনি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে কিছু

কাল শিক্ষা করিতে হইবে। আমি বরং বনের শৃগালের সহিত আলাপ করিব তত্রাচ তাঁহার সহিত নহে।

এই স্থানে আমার একটি গল্প বলিতে নিতান্ত হইতেছে, পাঠক মহাশয় বিরক্ত হইবেন না। এক দিবস কার্য্যবশতঃ বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় যাইব ট্রেণের সময় না হওয়া প্রযুক্ত একটী দোকানে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এমত সময় বাদ্য ভাণ্ড প্রভৃতি মহা আড়ম্বরে কতকগুলি লোক ও দুইখানা পাল্কি তথাতে উপস্থিত হইল, সঙ্গীয় ব্যক্তিগণকে দেখিলেই বিবাহের বরযাত্র বলিয়া জানা যায়। উক্ত দুইখানি পাল্কির একখানির মধ্য হইতে অস্ফুট স্বরে রোদন এবং আত্মগ্লানির ন্যায় শব্দ শ্রবণ হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন নব বিবাহিতা কন্যা পিত্রালয় ত্যাগ জন্য রোদন করিতেছে। কিন্তু তৎপরেই দেখি তাহার বিপরীত, কারণ ঐ অস্ফুট স্বরে ক্রন্দনকারী পাল্কি হইতে আমাদের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বিবাহের বর বলিয়া কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করা হইল, "মহাশয় কি কন্যার

পিতা? নহিলে এই শুভ কার্য্যে রোদনের কারণ কি?" বাবুটির বয়ক্রম আন্দাজ ৪৭।৪৮ বৎসর, গৌরবর্ণ, দোহারা, মুখে গোপ আছে এবং মস্তকে কাঁচা পাকা কেশ, নাম ও বাসস্থান অপ্রকাশ্য। বাবুটী উত্তর করিলেন "আমি এই বিবাহের বর।" তাঁহার উত্তর শ্রবণে দোকান স্থিত ব্যক্তি মাত্রই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেন, তবে রোদনের কারণ কি? বাবু কহিলেন, তাঁহার এই চতুর্থ পক্ষের বিবাহ, তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুলীনের ছেলে; আত্মীয় বন্ধু লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই বা রোদন কেন? বাবু বলিলেন "মহাশয়গণ! রোদনের কারণ আমি যথাযথ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

"প্রথমা স্ত্রীই সহধর্ম্মিণী পদে বাচ্য, দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করা আর ভগীরথের গঙ্গা আনা তুল্য, কারণ ভগীরথ আপন পিতৃকুল উদ্ধারের জন্য ভগবান দেবদেব মহাদেবের শিরবিহারিণী গঙ্গা দেবীকে এই মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃকুল উদ্ধার হ'ক না হ'ক, পৃথিবীস্থ পা-

তকীগণের যথেষ্ট উপকার হইল, কারণ তাহারা পুণ্যময়ী গঙ্গা অম্বুতে অবগাহন করিয়া কৃতকৃতার্থ এবং অন্তে স্বর্গভোগের অধিকারী হইল; সেইরূপ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর উপকার হ'ক না হ'ক, পাড়ার দশটী বকাটে ছেলের যথেষ্ট উপকার।

তৃতীয় পক্ষীয় স্ত্রীকে আমি ৺গদাধরের পাদপদ্মের সহিত তুলনা করি, কারণ মহাপাতকীর পিণ্ড ও যদি কেহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দান করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও পাপাত্মাগণের মুক্তিদাত্রী।

কিন্তু আমার এই চতুর্থ পক্ষে বিবাহ, ইহাঁর আবার কাহার সহিত উপমা দিব, কেবল তাহাই চিন্তা করিতে করিতে আমার রোদন হইতেছে।"

বাবুটীর কথা শেষ হইলে মহা কোলাহলের সহিত হাস্য উপস্থিত হইল। তাই বলি, কুলীন মহাশয়েরা ১০।১৫ গণ্ডা বিবাহ করেন, আপনার অথবা দেশের লোকের উপকার জন্য, কিন্তু আমি কি লিখিব আর কি লিখিতেছি।

ঈশ্বর শব্দে যদিও জগৎস্রষ্টাকে বুঝায়, কিন্তু

রাজাকেও ঈশ্বর বলিয়া থাকে যথা, ব্রজেশ্বর, লঙ্কেশ্বর, ভারতেশ্বরী ইত্যাদি—

সাধারণতঃ রাজা শত্রুকর্ত্তৃক অপদস্থ অথবা রাজ পরিবর্ত্তন হইবার প্রাক্কালে, তড়াগাদি জলাশয়ের জল বিষাক্ত অথবা শুষ্ক, প্রজার ধন মান হানি ও গৃহদাহ প্রভৃতি রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এমন কি রাজ্য একরূপ ছারখার হয় ও উচ্ছন্ন যায়।

আর প্রাণেশ্বরী—প্রাণরূপ রাজ্যের রাজ্ঞীপদে যাঁহাকে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া হৃদয়রূপ সিংহাসনে স্থাপন করা যায়, সেই প্রেম ও প্রণয়ময়ী রাজ্ঞীর অভাব হইলে প্রাণরূপ রাজ্যেরও ঐরূপ দুরাবস্থা হয়। অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ বিশেষ ক্ষেত্রের লাবণ্যরূপ শস্য নষ্ট, শিরা ও ধমনী বিশেষ নদীর রক্তরূপ জল শুষ্ক, মন ও ইন্দ্রিয়রূপ প্রজার স্ফূর্ত্তী ও উৎসাহ রূপ ধন মান হানি এবং দেহরূপ গৃহ সর্ব্বদা দাহ হইতে থাকে, বিশেষতঃ রাজ্ঞী অভাবে হৃদয়রূপ সিংহাসন শূন্য হয়, সুতরাং যাহার হৃদয় শূন্য, তাহার পক্ষে জগতও শূন্য।

যেমন মহার্ণবে নাবিক হীন পোত উদ্দেশ্য

বিহীন হইয়া বায়ু ও স্রোতকর্ত্তৃক নানা দিকে সঞ্চালিত হয় এবং বায়ুর প্রবলত্ব হইলেই জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ এই কায়ারূপ তরী পত্নীরূপা প্রেমময়ী নাবিকা বিহীনা হইয়া এই সংসার রূপ মহার্ণবে শোকরূপ বায়ু এবং মায়া ভগ্নরূপ স্রোতে উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া দিক্ বিদিক্ গমনাগমন করে এবং শোকরূপ বায়ু প্রবলতর হইলেই অনন্ত কালগ্রাসে নিমগ্ন হয়।

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "পুত্রাৎ প্রিয়োতর নাস্তি" হইতে পারে, কিন্তু সেটী কেবল স্নেহের প্রাবল্য মাত্র, নহিলে সকল সময়ে সকল অবস্থায় ও সকল কারণে পুত্র প্রিয়তর হইতে পারে না। স্ত্রী যেমন সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ও সকল কারণেই প্রিয় হইতে পারে, পুত্রে তাহার সম্ভব কোথায়? বস্তুতঃ প্রেম ও ভালবাসা একমাত্র পত্নীতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তুলনায় স্ত্রী হইতে পৃথিবীতে অন্য কেহই প্রিয়তর হইতে পারে না। তবে স্নেহে পুত্র প্রিয় বটে, কিন্তু স্নেহ এক, ভালবাসা আর।

স্নেহ ও ভালবাসার বিভিন্নতা দেখান সহজ নহে।

যেমন চিনি ও মিছরির আস্বাদন ও তাহাদের মিষ্ট- ত্বের বিভিন্নতা রসনেন্দ্রিয় দ্বারা সুবোধ করা যায়, কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না, সেইরূপ স্নেহ ও ভাল- বাসার ভিন্নতা দেখান কঠিন। সাধারণতঃ বাৎসল্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি মায়াকে স্নেহ ও বয়স্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি মায়াকে ভালবাসা বলে এবং স্নেহকে ভালবাসার রূপান্তর অথবা শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

যেমন পর্ব্বতোপরে জলরাশি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ক্রমে উৎস পরে ক্ষুদ্রনদী ও অবশেষে বৃহতী কায়াবিশিষ্টা হইয়া সাগরে পতিত হয়, জল অনবরত অবিশ্রান্ত উৎস হইতে সাগরে পতিত হইতেছে; নদী উৎস হইতে সাগর পর্য্যন্ত জল প্রবাহ মাত্র, অথচ নদীতে যে পরিমাণে জল হয়, উৎসে তাহার কণা মাত্র জল আছে বলিয়াও বোধ হয়না; সেইরূপ এক স্ত্রীতে ভালবাসা, স্নেহ ও মায়া অপরিমিত রূপে অবস্থিতি করে এবং তাহার কিয়দংশ মাত্র স্ত্রী হইতেই সন্তানে বর্ত্তে। যে স্নেহ কণিকা মাত্র সন্তানে বর্ত্তে, সেই কণিকাকেই নদীর- ন্যায় বৃহতী কায়াবিশিষ্টা এবং উহার আকর স্ত্রীকে

উৎসের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবাপন্ন সাধারণ চক্ষে লক্ষ্য হইয়া থাকে। যেমন উৎস হইতে জল অনবরত ও অবিশ্রান্ত সাগর গর্ভে পতিত হইতেছে, অথচ উৎসের জলের হ্রাস হয় না, সেইরূপ সন্তানে যত পরিমাণ স্নেহই বর্ত্তুক না কেন, তাহাতে স্ত্রীতে যে অপরিমিত স্নেহ ও ভালবাসা ন্যস্ত থাকে, তাহার কণামাত্রও হ্রাস হয় না, বস্তুতঃ অনন্ত সাগর হইতে যতই কেন জল ব্যয় হউক না, তাহাতে সাগরের অনন্ত ভাবের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। সুতরাং পুত্র হইতে স্ত্রীই প্রিয়তরা সন্দেহ নাই।

গতিকেই পুত্রশোক হইতে পত্নী শোক গুরুতর, পত্নী সহবাসে কালক্রমে পুত্রশোক নিবারণ হয়, কিন্তু পত্নী বিয়োগ শোকের ইয়ত্তা নাই, হ্রাস নাই, শান্তিও নাই বরং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইয়া হৃদয়ের শোণিত শোষণ, বুদ্ধিভ্রম, আহারের অরুচি, শরীর কৃশ, মন বিবাগী, কার্য্যে ঔদাস্য, জীবনে হতাদর এবং চিন্তায় আশক্তি করে, অবশেষে প্রাণ বায়ুকে লইয়া বহির্গত হয়।

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন যে, মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী জগতের পদার্থ মাত্র,

বিশেষত মনুষ্য দেহ ক্ষণভঙ্গুর, আজ হ'ক, কাল হ'ক, আর দশদিন পরেই হ'ক, সকলকেই যখন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তখন মৃত ব্যক্তির জন্য খেদ করিবার কারণ কি ? যেমন মহাসাগরে দুই খণ্ড কাষ্ঠ ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর একত্র হয় এবং কালসহকারে পরস্পর পৃথক হইয়া যায়, সেইরূপ সংসাররূপ মহাসাগরে স্ত্রী পুরুষ রূপ, দুই খণ্ড কাষ্ঠ একত্র মিলন হয়, আবার কাল সহকারে উভয়ে পরস্পর পৃথক হয়। যখন জন্মিলেই মৃত্যু, সংযোগ হইলেই বিয়োগ, প্রণয় হইলেই বিচ্ছেদ অবশ্যই হইবে, তখন স্ত্রী বিয়োগে এত শোকান্বিত হইবার কারণ কি ? আবার আজ তুমি অন্যের অভাবে আক্ষেপ করিতেছ, কল্য আবার তোমার বিয়োগে কেহ না কেহ আক্ষেপ করিবে। জগতের নিয়মই এই ! তখন বৃথা শোকাকুল হইবার কারণ কি ? কারণ "ভালবাসা" !! ভালবাসারূপ গন্ধকে শোকরূপ অগ্নি সংযোগ হইয়া মনরূপ গৃহ সর্ব্বদা হুহু শব্দে জ্বলিতেছে, এ অগ্নি নির্ব্বাণের কোন উপায় নাই। যতদিন না পঞ্চে পঞ্চ

মহাভূতের লয় হয়, ততদিন এ অগ্নি প্রশমিত করিবার উপায় কি আছে ?

আত্ম জ্ঞানরূপ বারি সিঞ্চনে শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অনেকে উপদেশ করেন ; হইতে পারে, চিত্ত বিজয়ী মহাত্মাগণ শোকে মোহে কাতর হন না, বরং সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, ইষ্টে অনিষ্টে মিত্রে অমিত্রে, শোকেও হর্ষে তুল্য জ্ঞান করেন, এবং স্বীয় জ্ঞান বলে মহামায়াকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক সুখ দুঃখকে উপহাস করেন, কিন্তু এই ভূমণ্ডলে সেই রূপ চিত্তবিজয়ী মহাত্মা কজন আছেন ! মনুষ্য দূরে থাক, ভগবান জগতকর্ত্তা মহাবিষ্ণুও মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই ; তাঁহাকেও সময়ে যোগনিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়, যথা—

" তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো
যোগ নিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ
তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ চণ্ডী।

প্রায়ই লোকে বলিয়া থাকে যে
"চৈত্রমাসে ডুবে ইঁটে।

ভাদ্রমাসে ছাড়ে ভিটে॥
শেষকালে যার মরে মাগ।
এই তিন ভেড়েগে মেঙ্গে খাক॥

উল্লিখিত তিনটী কথাই যুক্তি সঙ্গত, কারণ চৈত্রমাসে বর্ষার জলে জমি প্লাবন হইলে, আবাদ হইল না,সুতরাং ভূস্বামীকে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; ভাদ্রমাস আশুধান্যের মরসুম সময় এবং আমন অর্থাৎ হৈমন্তিকধান্যে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ থাকে,এই সময় ঐ সমস্ত ধান্যাদির আশা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি গ্রামান্তরে যাইয়া বাসকরে, তাহার পর দয়া ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে পরিবার ভরণ পোষণ করিবার সম্ভব আছে ? আর শেষকালে স্ত্রী বিয়োগ যন্ত্রণা অসহ্য, যাহার দংশনে উন্মাদ হইয়া সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার নিমিত্ত আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি—যে যন্ত্রণায় মন সর্ব্বদা ব্যাকুলিত, ইন্দ্রিয়গ্রাম শিথিল ও ক্ষুধার মন্দতা হয় এবং স্বভাবের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, সময়ে স্নান সময়ে আহার বা সময়ে নিদ্রা হয় না, গতিকেই আত্মীয় স্বজন যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা বিরক্ত না হইলেও কষ্ট ভোগ করেন,

অথচ শুশ্রূষাও রীতিমত করিয়া উঠিতে পারেন না এরূপ স্থলে পর গলগ্রহ হইয়া পরকে কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা গৃহত্যাগ করাই প্রশস্ত ও অতি কর্ত্তব্য।

আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু বলিতে পারেন যে তোমার শেষকাল উপস্থিত হয় নাই, তবে গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?" শেষকাল বলিলেই যে অন্তিম সময়কে বুঝাইবে তাহা নহে। স্ত্রীর সহিত প্রকৃত প্রণয় জন্মিবার পূর্ব্বকে পূর্ব্বকাল এবং জন্মিবার পর কালকে শেষকাল বলিতে হইবে। বিশেষ আমি গৃহত্যাগ করিতেছি না, গৃহই আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; যথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"।

অনেকে ইহাও বলিতে পারেন যে একটি গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আবার আর একটী প্রস্তুত করিলেই হইবে, বিশেষতঃ কুলিনের ছেলে গৃহ প্রস্তুত করিতে ব্যয়ও হইবে না, অনেক প্রস্তুত গৃহতেই গৃহীর অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু লোকে বলিয়া থাকে, "বিবাহ দ্বিতীয় পক্ষে, সেটী কেবল পিত্তিরক্ষে," দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহের গুণাগুণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এস্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু আবার ইহাও বলিবার সম্ভব যে এই জগতে কয়জন সমচরিত্রের লোক পাওয়া যায়, ঈশ্বর সৃষ্টিতে এক চরিত্রের দুই ব্যক্তি পাওয়া কঠিন, বিশেষ লেখক যখন অদৃষ্টবাদী, তখন হয়ত অদৃষ্টক্রমে পুরাতন অপেক্ষা নূতন গৃহ উত্তমরূপ হইতে পারে। স্বীকার করি,—কিন্তু লোকেবলে, "যে মূলাটী বাড়ে, তাহাকে দুই পাতায় জানা যায়"তাই বলি যদি আমার অদৃষ্ট ভাল হইবে, তবে বাল্য কালে মাতৃবিয়োগ, তৎপর পিতৃবিয়োগ এবং মাতৃ-সমা স্নেহময়ী পিতৃ মাতুলানী বিয়োগ অবশেষে প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরী প্রাণাধিকা প্রিয়তমা প্রিয়-সীকে ৺গঙ্গা সলিলে স্বহস্তে বিসর্জ্জন করিতে হইবে কেন? হায়! যে দুঃসময়ে প্রাণের প্রাণকে গঙ্গা দিতে একামাত্র লইয়া যাই, পবিত্র গঙ্গাম্বুতে প্রিয়-তমার দেহ আবক্ষ মগ্ন করিয়া এবং মস্তকে স্বীয় উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক শোকে বিহ্বল চিত্তে উচ্চৈ-স্বরে জগদীশ্বরের নাম প্রিয়তমার কর্ণকুহরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রিয়সীর মুখে জন্মের মত গঙ্গাজল অল্প অল্প করিয়া দিতে আরম্ভ করিলাম, গঙ্গাজল পান করিয়া প্রাণাধিকার ক্রমে জ্ঞানোদয় হইতে

লাগিল,সঙ্গে২ আমার দুরাশাও বৃদ্ধি হইতেলাগিল। প্রিয়সী জল হইতে হস্ত পদ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া এক অপরিচিত বন্ধুর সাহায্যে প্রিয়তমাকে গঙ্গাজল হইতে তীরে উঠাইলাম এবং আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইলাম এবং দুগ্ধে ও গঙ্গাজলে মিশ্রিত করিয়া মুখে দিলে অগ্রে অল্প অল্প পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আপন হস্তে পান পাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাক্‌শক্তি হইলে, হায় বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়া আমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া কেবল এই কয়েকটী শব্দ বলিলেন, "দেখ আবার বিয়ে কোরো, পাগোলের মত বেড়াইওনা," আর কোন কথাই বলিলনা,ক্রমে চক্ষু ঊর্দ্ধ,পরক্ষণে স্থির, আবার গঙ্গাজলে তৎক্ষণাৎ নামাইলাম এবং পূর্ব্বমত ঈশ্বর নামানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম এবং মহানগরী ভারতের রাজধানী কলিকাতার পশ্চিম পার রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে পবিত্র পুণ্যময় গঙ্গাসলিলে প্রাণের প্রাণ প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিলাম। ১২৮৯ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ শনিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে দিবা ২॥০ প্রহর

সময় হৃদয়ের প্রেম ও স্নেহময়ী স্বর্ণ প্রতিমাকে স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিলাম।

যে স্ত্রী মৃত্যুর প্রাক্কালেও স্বামীর ভবিষ্যত চিন্তা করিতেছিল, আপনি মরিতেছে সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই, মরিলে প্রিয়তম পতির কি দশা হইবে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও যে তাহাই ভাবিতেছিল এবং আসন্ন সময়েও যে স্বামীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছিল, জগতে এরূপ স্ত্রী অতি দুর্ল্লভ—তাইবলি যদি আমার অদৃষ্ট ভাল হইবে, তবে এই ত্রিংশতবর্ষ বয়ক্রমে গৃহের লক্ষ্মী জীবনের সুখ, ভবিষ্যতের আশা, কার্য্যের স্ফূর্ত্তী মনের আনন্দ, সংসারের আশক্তি, দেহের জীবন, হৃদয়ের শোণিত এবং নয়নের তারারূপা বাল্যসহচরী গুণবতী ভার্য্যাকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া জগৎ শূন্যময় দেখিতে হইবে কেন?

শাস্ত্রে বলে "অমৃতা গুণবতী ভার্য্যা" ফলতঃ আমার প্রণয়নী প্রকৃত গুণবতী ছিলেন, যাঁহার সহবাসে স্বর্গ সুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান হইত। সংসারে যে একমাত্র সুখ-দায়ক অমূল্য-রত্ন প্রণয়শালিনী সাধ্বী স্ত্রী তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, যাহাকে

পরম যত্নে হৃদয়ের মধ্যদেশে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না! তাই বলি যদি আমার অদৃষ্ট ভালই হইবে, তবে বিধাতার বিড়ম্বনে অথবা আমার কর্ম্মদোষে অকালে কালরূপ চোর হৃদয় ভগ্ন করিয়া অমূল্য নিধি হরণ করিবে কেন? আমাকেই বা জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত—অসহ্য দুর্ব্বিহ শোকরূপ নরকাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেও শূন্যহৃদয়ে জীবিত থাকিতে হইবে কেন?

যদি ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, মর্য্যাদা, কুল, পদ, পদার্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ঘর-বাড়ি প্রভৃতি সর্ব্বস্বান্ত হইত, এমন কি যদি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত যাইয়াও কেবল কৌপিন মাত্র পরিধান করিয়া বৃক্ষতলে দুই দিবসান্তে ভিক্ষালব্ধ যথা কথঞ্চিৎ কদান্ন অথবা বৃক্ষপত্র মাত্র আহার করিয়াও প্রিয়তমার সহবাসে বঞ্চিত না হইতাম, তবে স্বর্গসুখে কালাতিপাত করিতে পারিতাম সন্দেহ নাই।

অনেকে আমাকে স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, তাহাতে আমি বিরক্ত নই, বরং আহ্লাদিত। স্ত্রৈণ অর্থে স্ত্রীর প্রেমের বশীভূত স্বামীকে বুঝায়। এই সংসারে কে প্রেমের বশীভূত নহে?

এই অসার সংসার কেবল একমাত্র প্রেমরজ্জুতেই বদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং সংসারের যাবদীয় প্রাণীকেই প্রেমের বশীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রাজাধীরাজ রামচন্দ্র সীতার শোকে হতচৈতন্য হইয়া লতা পল্লব এবং বৃক্ষাদিকেও মানবের ন্যায় সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র একজন সামান্য মনুষ্য ছিলেন না, অদ্যাবধিও স্বয়ং বিষ্ণু বলিয়া যাঁহার আরাধনা হয় এবং কেবল লোক শিক্ষার্থে যাঁহাব অবতার হওয়া প্রচার আছে, যিনি রাজত্ব পরিবর্ত্তে বনগমনেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; সেই আত্মজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা রামচন্দ্রও পত্নী শোকে অধীর হইয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতিও শক্তির প্রেমে তাঁহার চরণতলে স্থান লইয়াছিলেন।

প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত না হইয়া বিধিসিদ্ধ পাত্রে ন্যস্ত হওয়াই উচিত এবং সর্ব্ববাদী সম্মত, তখন স্ত্রৈণ হওয়া দোষের বিষয় নহে, বরং প্রশংসনীয়। জগতের পুরুষ মাত্রে স্ত্রৈণ হইলে সুরাপান, বেশ্যা-শক্তি, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও নরহত্যা প্রভৃতি নানা-

বিধ পাপরাশির এককালে ধ্বংশ হইত, সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কি লিখিব আর কি লিখিতেছি।)

দাম্পত্য প্রণয়ই বিবাহের এক মাত্র শুভফল, তাহা যতদূর হইবার হইয়া গিয়াছে, এইক্ষণে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিলে সেরূপ হওয়া পরের কথা, সে আশাও করা যাইতে পারে না; যেহেতু উভয়ের একরূপ মনভাব না হইলে প্রণয় জন্মে না। জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের একরূপ মনোভাব থাকে না, শিশুর মনোবৃত্তি হইতে যুবার মনোবৃত্তি পৃথক, আবার যুবার মনোবৃত্তি হইতে প্রৌঢ় বয়স্কের মনোবৃত্তি ভিন্ন, এইরূপ প্রৌঢ় বয়স্কের মনোবৃত্তি হইতে আবার বৃদ্ধের মনোবৃত্তি অন্য মত, সুতরাং শিশুর মনোভাব ও যুবার মনোভাব ঐক্য হইতে পারে না, প্রণয়ও এতদুভয়ে প্রকৃতরূপে জন্মে না। আমার এইক্ষণ বিবাহ করিতে হইলে অষ্টম অথবা দশম বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে হয়, সুতরাং তাহার সহিত প্রণয় হইবার সম্ভব কোথা?

অনেক হিন্দু শাস্ত্রাধ্যাপক বলেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্" অতএব যে

নিমিত্ত ভার্য্যার আবশ্যক, যখন তাহারই অভাব, তখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন না করা কেবল স্বেচ্ছাচারিত্বই বলিতে হইবে।

কিন্তু আমি বলি "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এটী কেবল প্রথমা স্ত্রীতেই খাটে, দ্বিতীয়াদি পক্ষের স্ত্রীগণে খাটে না, তাহার প্রমাণ ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।

পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা সামাজিক বিধিসিদ্ধ হইলেও যুক্তি এবং ন্যায়সঙ্গত নহে, যেহেতু প্রকৃত প্রণয়ের ফল আত্ম বিসর্জ্জন, অর্থাৎ আত্ম সমর্পণ ব্যতীত প্রকৃত প্রণয় জন্মে না, সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পর আত্ম সমর্পণ করিতে হয়। বস্তু দান করিলে তাহাতে আর দাতার অধিকার থাকে না, গৃহীতারই সম্পূর্ণ অধিকার। দাতা-দত্তা বস্তু আত্মসাৎ করিলে তাঁহাকে দত্তাপহারী হইতে হয়। মনুষ্যের একটী মাত্র চিত্ত, তাহা পূর্ব্ব প্রণয়িনীকে সর্ব্বতোভাবে দান করা হইয়াছে, পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিলে কি প্রকারে সেই নব বিবাহিতা স্ত্রীকে দত্তাবস্তুর অধিকারিণী করা যাইতে পারে?

যদিও বেদ, কোরাণ, বাইবল প্রভৃতি কতগুলি

গ্রন্থকে সম্প্রদা বিশেষের লোক ঈশ্বরলিপি বলিয়া স্বীকার করেন এবং ঐসকল গ্রন্থোল্লিখিত বিধিমত কার্য্য বিশেষে দোষ থাকিলে ও শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া বরং গুণানুবাদই করিয়া থাকেন, কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বর আমা-দিগকে যাবদীয় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারি এবং যাহাতে মানবগণ ন্যায়বান ও স্বার্থ শূন্য হয়, জ্ঞানী মাত্রই তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ন্যায়বান ও স্বার্থশূন্য হওয়াই এক মাত্র ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতাগণ হিন্দু বিধবা রমণীগণের যে রূপ কঠিন ব্যবস্থা করিয়াছেন, হিন্দু পুরুষদিগকেও পত্নী অভাব হইলে সর্ব্বতোভাবে বিধবা রমণীগণের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ন্যায় পরায়ণ ও স্বার্থশূন্য হওয়া যা-ইতে পারে।

পতির অভাব হইলে পত্নী মৃত পতির প্রেম পরম যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরণ কাল বিরহা-

নলে দগ্ধ হইতে থাকেন, এমন কি তাঁহাকে এক প্রকার সমাজচ্যুত, অনাহার ও সর্ব্ব প্রকারের বি-লাস বিহীন হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হয় এবং পার্থিব সুখ, সচ্ছন্দতা প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল দেহ মাত্র ধারণ পূর্ব্বক মৃত্যু প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে হয়। পতি সেই পরম পবিত্র প্রেমের বিনিময়ে নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সাধারণ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত জন্য পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিলাস ভোগাশক্ত হইলে কি মূঢ়তার কার্য্য হয় না? ইহা হইতে জগতে স্বার্থ পরতা অনার্য্যতা ও কৃতঘ্নতা আর কি হইতে পারে?

মূল হিন্দুশাস্ত্রেও পুরুষের কেবল একমাত্র স্ত্রীই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে হিন্দুগণের বিবাহ করিবার পূর্ব্বে পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয় যাহাকে নান্দিমুখ অথবা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বলিয়া থাকে, পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের কোন রূপ পিতৃ কার্য্যে অধিকার নাই, সুতরাং পুত্রোদ্বাহ কালে পিতাকে উক্ত নান্দিমুখ করিতে হয়, কিন্তু যদি পিতা বর্ত্তমানে পুত্রে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ

করেন, তবে সেই বিবাহে নান্দিমুখকর্ত্তা পিতা হইবেন না, পুত্রকেই পিতা বর্ত্তমানে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া উক্ত নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পুরুষের দ্বিতীয়াদি পক্ষে বিবাহ করা পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম সম্মত নহে।

প্রথমা পত্নীকেই সহধর্ম্মিণী ও দ্বিতয়াদি পত্নীগণকে কাম পত্নী বলে। কেবল কামের প্রবলতা হেতু সাধারণ ইন্দ্রিয় তৃপ্ত জন্য যাহাকে গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ যাহার সহিত আদৌ ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, সেই কামপত্নী; সাধারণ বেশ্যাকেও কামপত্নী বলা যাইতে পারে। কাম পত্ন্যাশক্ত বেশ্যাশক্ত তুল্য না হইলেও নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই।

যে স্থলে আদৌ কামপত্নীর সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, সে স্থলে সেই পত্নী-গর্ভজাত পুত্রে কি প্রকারে পিণ্ডদান অধিকারী হইতে পারে? যদি কামপত্নী-গর্ভজাত-পুত্র পিতৃকার্য্যে অধিকারী হইল, তবে উপপত্নী-গর্ভজাত-পুত্র কি জন্য উক্ত কার্য্যের অধিকারী না হয়?

ফলতঃ কাম-পত্নী-গর্ভজাত-পুত্র কোন ক্রমেই পিতৃ কার্য্যের অধিকারী হইতে পারে না। যে পুত্রে পিতৃকার্য্যের অধিকার হইল না, সেই পুত্রার্থে পুনর্ব্বার দ্বার পরিগ্রহ করিবার আবশ্যক কি?

কিন্তু বহু প্রাচীন কালাবধি কাম-পত্নী গর্ভজাত পুত্রে পিতৃকার্য্য করা ব্যবহার আছে; এত কাল কি সমাজে অশাস্ত্রিক কার্য্য হইয়া আসিতেছে? হাঁ, আসিতেছে বটে, কিন্তু সে যেমন "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ"।

অযোধ্যাধিপতি মহাত্মা রামচন্দ্র অপত্যোৎপাদন হইবার পূর্ব্বেই স্বীয় প্রেয়সী সীতাদেবীকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। যদি পত্ন্যান্তর গ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত হইত, তবে তিনি অবশ্যই পুনর্ব্বার দ্বার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্তানউৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। রামচন্দ্র নাস্তিক অথবা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, সুতরাং তিনি যে শাস্ত্র শাসন অমান্য করিয়াছিলেন তাহাও বলা যাইতে পারে না।

অনেকে বলেন যৎকালে সীতাদেবী নির্ব্বাসিতা হন, সেই সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং অপত্যবতী, হইবারও সম্ভব ছিল, সুতরাং

রাম পত্ন্যন্তর গ্রহণ করেন নাই—কিন্তু যে পত্নীকে সাপরাধিণী জ্ঞানে গৃহ বহিষ্কৃত করিতে হইয়াছিল, তৎপর সেই পত্নী গর্ব্ভোৎভব সন্তান কি প্রকারে গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে?

বস্তুতঃ সীতাদেবীর গর্ভোদ্ভব সন্তান গ্রহণাভিপ্রায়ে যে রামচন্দ্র পত্ন্যন্তর গ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে, কারণ যদি রামচন্দ্রের ঐ সন্তান গ্রহণেচ্ছা থাকিত, তবে তাহারা ভূমিষ্ট হইবা মাত্র অথবা তাহার কিছুদিন পর গ্রহণ করিলেও করিতে পারিতেন, তাহা না করাতেই প্রমাণ হইতেছে যে তাঁহার ঐ সন্তান পূর্ব্বে গ্রহণেচ্ছা ছিল না, পরে যখন বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক সীতাদেবীর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইল, সেই সময়ে রামচন্দ্র সীতার গর্ব্ভজাত লব ও কুশকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কেবল প্রথমা স্ত্রীতেই বর্ত্তে, দ্বিতীয়াদি স্ত্রীগণে নহে।

বিশেষতঃ আমার সহধর্ম্মিণী বন্ধ্যা [illegible] না, তাঁহার তিন চারিটী সন্তান হইয়াছিল, অদৃষ্টে থাকিলে তাহারাই দীর্ঘজীবি হইত এবং পুত্রোচিত কার্য্য করিত।

যে কোন কার্য্যের আস্বাদ একবার পাওয়া যায়, পুনর্ব্বার সেইরূপ কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে সেই কার্য্যের সুখ ও দুঃখ হৃদ্বোধ হয়। দাম্পত্য প্রণয় সুখের পরাকাষ্ঠা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতে দুঃখের আতিশয্যতাও বিলক্ষণ আছে।

এ সংসারে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বন্ধনের সুখ দুঃখ একবার আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি কখনই পুনর্ব্বার ইচ্ছাক্রমে বন্ধন লইতে স্বীকার করেন না।—মনুষ্য কেন ? সামান্য পশু পক্ষীতেও ইচ্ছাক্রমে বন্ধন লয়না। বিবাহ বন্ধন মাত্র;—রজ্জু অথবা শৃঙ্খলের বন্ধন হইলে, কালক্রমে বন্ধন শিথিল হয় এবং সময়ে মুক্ত হইবারও সম্ভব থাকে, কিন্তু স্ত্রী রূপ রজ্জুতে বন্দী হইলে, এ বন্ধন এত কঠিন যে কস্মিনকালেও ইহা শিথিল হইবে না বরং উত্তর উত্তর দৃঢ়তর হইবে।

হস্তীমূর্খ অথবা বাঙ্গালী বাবু ব্যতীত কে স্বেচ্ছাধীন বন্ধন লয় ও পরাধীনতা স্বীকার করে ? বিধাতার বিড়ম্বনে যখন সংসারের একমাত্র বন্ধন, পতিব্রতা প্রণয়শালিনী সাধ্বী ধর্ম্ম পত্নীরূপ রজ্জু অকালে কালরূপ কীটে ছেদন করিয়া ধর্ম্ম বন্ধন

হইতে মুক্ত করিয়াছে, তখন কামপত্নীরূপরজ্জুতে বন্দী হইবার আর কি প্রয়োজন আছে?

আমার এ সংসারে কে আছে যে তাহার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে কাম ফাঁদে বন্দী হইব? বৃদ্ধ পিতা অথবা মাতা নাই যে আমি কামরজ্জুতে বন্দী না হইলে তাঁহাদের শুশ্রূষা হইবে না! শিশু সহোদর সহোদরা অথবা সন্তান নাই যে তাহাদের লালন পালন হইবে না, তবে আর কি জন্য কাম রজ্জু প্রার্থনীয়? এ সংসারে আমাকে আমার বলিতে কেহ নাই—তবে কেন আর কাম রজ্জুতে বন্দী হইয়া আমরণকাল কেবল পরের দাসত্ব বৃত্তিতেই দিন যাপন করিব?

হৃদয়ের সুখ দুঃখভাগী অন্ধের যষ্টির ন্যায় স্নেহাস্পদ একমাত্র প্রাণাধিক কনিষ্ঠভ্রাতা আছে, যাহাকে মনে হইলে এই দুঃখ পরিপূর্ণ হৃদয়ও হর্ষান্বিত হয়, সেই প্রিয়তম ভ্রাতাকে মনে হইলে এক একবার হস্তী মূর্খের ন্যায় বন্ধন গ্রহণেচ্ছা হয়, কিন্তু কেন? এইক্ষণ সে ঈশ্বর ইচ্ছায় হিতাহিত বিবেচনাক্ষম হইয়াছে এবং আপন জীবন উপায় করিতেও সক্ষম হইয়াছে; আমি বন্ধন না লইলে

অযত্নে অথবা অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে না, তবে আর কাহার জন্য বন্ধন স্বীকার করিব? যখন যে স্থলে যে অবস্থায় কালাতিপাত করিব, সেই স্থলে, সেই ভাবেই জগতপাতা জগদীশ্বরের নিকট কায়মন বাক্যে তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিব, এতদ্ব্যতীত এ হতভাগা হইতে আর কি উপকার সম্ভবনীয়? যাহার হৃদয় হইতে পবিত্র প্রেমলতা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, যাহার বুদ্ধির স্থির নাই সংসারে আশক্তি নাই, ধর্ম্মে আস্থা নাই, ও জীবনে আদর নাই, তাহাহইতে অন্য কি উপকার সম্ভবনীয়?

শোকে মুগ্ধ হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিত হওয়া উন্মাদের কার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি যদি উন্মাদ হইতে পারিতাম, তবে বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতাম, কারণ তাহাহইলে পতিব্রতা প্রেমময়ী গুণবতী ভার্য্যার চির বিরহরূপ অসংখ্য বৃশ্চিক দংশনের ক্লেশ আর অনুভব করিতে হইত না।

শোকে বিহ্বল হইলে কেবল শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ ব্যতীত অন্য কি ফল সম্ভবনীয় কিন্তু অনবরত অবিশ্রান্ত যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ

করিতেছি—জগতে এমন অন্য কি যন্ত্রণা আছে যে তাহা অপেক্ষা গুরুতর হইবে?

অতীত দুর্ঘটনা অনুশোচনে কেবল উত্তর উত্তর শোক বৃদ্ধি মাত্র, অতএব যতদূর সাধ্য, ঐরূপ চিন্তা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এজীবনে যদি প্রাণ প্রেয়সীর কোন সুখ থাকে, তবে কেবল মাত্র সেই স্বর্গাগত মনোহর মূর্ত্তিকে ধ্যান, তাঁহার কৃত-কার্য্যের পর্য্যালোচনা, তাঁহার শ্রবণ তৃপ্তকর সুধা-ময় প্রেমব্যঞ্জক বাক্যের স্মৃতি এবং তাঁহাকে অনন্যমনে অবিশ্রান্ত চিন্তা! কে জীবতাবস্থায় স্বীয় সুখদায়ক পদার্থ ইচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে পারে? জগতে আমাকে পাষণ্ড মনে করুক, উন্মাদ বলুক, অজ্ঞান বলুক, কিছুতেই ক্ষতি নাই, কিন্তু একমাত্র সুখ প্রসবিনী চিন্তা ত্যাগ করিয়া কি লইয়া এই দুঃখময় জীবনাবশিষ্ট কাল যাপন করিব?

যে মহাত্মা মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি জগতের আধার এবং দেব ও যোগীগণ পরমারাধ্য সেই ভূত ভাবন ভগবান ভবানীপতি দেব দেব মহাদেব স্বয়ং মায়া অতীত হইয়াও পত্নী শোকে উন্মাদ হইয়া মৃত

সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তুমি আমি কোন্ ছার?

ফলতঃ স্মৃতি স্বেচ্ছাধীন নহে; সুতরাং গতানুশোচনাও ইচ্ছামত ত্যাগ করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে হৃদয়ের অধিশ্বরী করিয়া যাঁহাকে মন প্রাণ ও জীবন দান করিয়াছি, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া কি তাচ্ছল্য কথা? একি স্বর্ণহার?—যে ইচ্ছা হইল পরিলাম, ইচ্ছা হইল তুলিয়া রাখিলাম? ইহার নাম প্রেম! যাহার প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের চরণ মস্তকে ধারণ,—পাণ্ডবগণের সারথ্য এবং বলীর দ্বারী হইয়াছিলেন,—যাহার প্রভাবে স্বর্ণ অট্টালিকা ও পট্টবস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া কেবল বল্কল মাত্র পরিধান করিয়া সীতা রামের—দময়ন্তী নলের এবং সাবিত্রী সত্যবানের সহ বনগমন করিয়াছিলেন,—যাহার প্রভাবে আর্য্যকুল গৌরব রাজাধিরাজ অযোধ্যাপতি ভগবান রামচন্দ্র নীচ কুলোদ্ভব গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্রতা করিয়াছিলেন,—যাহার প্রভাবে ভগবতী সতীদেবী দক্ষালয়ে পিতা কর্ত্তৃক পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন,—গান্ধারী

অন্ধ পণ্ডিতকেও তাচ্ছল্য করেন নাই, এবং সীতা দেবী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়াও বিজন কাননে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, অধিক কি, যাহার প্রভাবে জগতের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে এবং যাহাতে জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই প্রেম ও ভালবাসার আধাররূপা মৃত ভার্য্যার পূর্ব্ব প্রেম বিস্মরণ হওয়া তামাসার কথা নহে!!! কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি যে প্রেয়সী এক দিনের জন্যও সঙ্গ ছাড়া হন নাই, যাঁহাকে দেশান্তরে লওন জন্য আত্মীয় বন্ধু, সুহৃদ ও প্রতিবাসীগণের কত গ্লানি, কত ব্যাঙ্গ ও কত কটূক্তি সহ্য করিয়াছি এবং অদ্যাবধিও করিতেছি, যিনি জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন এবং যাহার বিরহে অদ্যাবধি সুষুপ্তি অনুভব করিতে পারি নাই, তাঁহাকে কি মনে করিলেই বিস্মরণ হওয়া যায়? জীবনান্ত হইলে যদি সেই প্রণয়িণীর চন্দ্রবদন দেখিতে পাই, তবে জীবন তৃণ জ্ঞানে কৃতান্তকে মনের আনন্দে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করি। মরিলে কি আর তারে পাইব?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

যেমন দর্পণ-মধ্যবর্ত্তী স্বীয় প্রতিবিম্ব স্বীয় অবয়বের অনুরূপ হয়, সেই প্রকার যাহার প্রতি যে রকম ব্যবহার করা যায়, তাহার নিকট হইতেও সেই মত ব্যবহার পাইতে হয়; অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে হিংসা করি, তবে তুমিও আমাকে প্রতিহিংসা করিবে, যদি আমি তোমাকে ভাল-বাসি, তবে তুমিও আমাকে ভালবাসিবে, চেতন পদার্থের কথা দূরে থাক্, যদি এক খানা শুষ্ক কাষ্ঠকে আঘাত করা যায়, তবে ঐ কাষ্ঠেও প্রত্যাঘাত করিয়া থাকে; জগতের নিয়মই এই। কিন্তু আমি যাহার জন্য দিবানিশি রোদন করি-তেছি, যাহাকে স্বীয় প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জ্ঞান করি, তবে সে কি জন্য আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না? অদ্য জানিলাম বিজ্ঞান চর্চ্চা বৃথা, নৈস-র্গিক নিয়মও মিথ্যা; কেবল কতগুলি বাগাড়ম্বর মাত্র।

ফলতঃ বিজ্ঞান চর্চ্চা বৃথা নহে, নৈসর্গিক নিয়মও মিথ্যা নহে, আমার বুঝিবার ভ্রম। কারণ যখন প্রেয়সী জীবিতা ও দেহাভিমানিনী ছিলেন, তিনিও আমাকে ভাল বাসিতেন, আমার বিচ্ছেদ ক্ষণকাল মাত্রও সহ্য করিতে পারিতেন না, এমন কি কোন দিন আফিস হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে কত রোদন করিতেন, আবার আমাকে দেখিবা মাত্র তখনই হাসিতেন। কেন, অনেক দিবস গত হইল বলিয়া কি আমার স্মরণ হয় না যে কোন পীড়ায় আমার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, তিনি বিষ পান করিয়াছিলেন? পরে কত চিকিৎসায় কত যত্নে ও কত চেষ্টায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়!!!

যদি আমাকে তিনি প্রাণাধিক ভাল না বাসিতেন তবে তাঁহার জন্য আমার প্রাণ দ্বীপান্তরিত কয়েদী অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় মরণাধিক নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে কেন? আর এখন তিনি ভৌতিক দেহী নহেন তাঁহার আর সে দেহ নাই, সে মন নাই, সে হৃদয় নাই, সে স্মৃতিও নাই, তিনি এখন মায়াতীত; সুতরাং আমার প্রতি তাঁহার সে মমতা নাই, সে প্রেম নাই, সে ভালবাসাও নাই।

কিন্তু যদি তাঁহার আমার প্রতি ভালবাসা না থাকিবে, তবে তাঁহার জন্য আমার এত যাতনা হইবে কেন? নৈসর্গিক নিয়ম মানিলে তাঁহার যে আমার প্রতি ভালবাসা এখনও আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ভালবাসা থাকিলেও তাহা দেখাইবার উপায় নাই। তাই বলি তিনি আমার জন্য অবশ্য অপেক্ষা করিতেছেন, সময়ে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইলে তিনি আমাকে লইয়া বাঞ্ছিত স্থানে গমন করিবেন।

কিন্তু এ যে উন্মাদের কথা! কেন? কেহ কি নিশ্চয় বলিতে পারে মানুষ মরিয়া কি হয়? ভৌতিক, জড় দেহত নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে, তবে মরে কে? মরণই বা কাহাকে বলে?

বস্তুতঃ কেহই মরে না! ভৌতিক দেহ হইতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অন্তর্হিত হওয়াকেই মরণ বলে।

চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই বা কি?

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অক্ষর ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার বিকৃত অংশ, যাঁহাকে ক্ষরব্রহ্ম অর্থাৎ

জীবাত্মা বলিয়া থাকে, এবং যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়াদি জগতের ক্রিয়া কলাপ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা নিত্য-সনাতন পদার্থ এবং তাঁহার জরা, মৃত্যু ও বিনাশ নাই এবং দেহ নাশে তাঁহার নাশ হয় না।

যথা—

যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্ম্মৃষাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যঃ তন্নাশো ন ভবেৎ খলু

শিব সংহিতা।

ন যায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভুত্বা
ভবিতা বা নভূয়ঃ। অজো নিত্য শাশ্বতো-
হয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

ভগবদ্গীতা।

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদৃশং।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপে বিরাজতে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যদি আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেন এবং দেহ নাশে তাঁহার নাশ না হইল, তবে দেহান্তে তিনি কোথায় অবস্থিতি করেন?

এ বিষয়ে নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকার মত।

বৌদ্ধেরা বলেন, দেহীর দেহ নষ্ট হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হন, সৎ অসৎ কর্ম্মের অর্থাৎ পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ দেহ সত্বে হইয়া যায়, পরন্তু ঐ কর্ম্মফল ভোগ জন্য পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিতে হয় না।

অনেকে আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে দোষা-রোপ করেন, মহাত্মা দত্তাত্রেয় বলেন, যদি দেহ নাশ হইলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইত, তবে কেহ মোক্ষাভিলাষী হইত না, কারণ কুকুর শূকর প্রভৃতি অতি ঘৃণিত জীবেও যখন মৃত্যুতেই অবশ্য মোক্ষ অধিকারী হইল এবং যাহা বাঞ্ছা না করিলেও প্রাপ্ত হইবে, তাহার জন্য কে অভিলাষ করে?

যথা—

জীবন্মুক্তৌচ যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতনে।
যা মুক্তি পিণ্ড পাতনে সা মুক্তিঃ শূনি শূকরে॥

জীবন্মুক্তি গীতা।

কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা অজর অমর হইলেও তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনি প্রাপ্ত পূর্ব্বক পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত পাপ

পুণ্যের ধ্বংশ না হয় সে পর্য্যন্ত মোক্ষাধিকারী হইতে পারেন না।

যথা—

জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধো ভবেৎ।
ভোগায়েৎ পদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুনঃ পুনঃ॥
জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্ব কর্ম্মভিঃ।

শিব সংহিতা।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভাশুভ মেব বা।
তাবন্ন যায়তে মোক্ষা নৃণাং কল্প শতৈরপি।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কেহ বলেন দেহনাশান্তে জীবাত্মাকে লিঙ্গ শরীর ধারণ এবং সম্বৎসর প্রেতলোকে অবস্থিতি করিতে হয়। পুত্র অথবা পুত্র স্থানীয় ব্যক্তি বৃষোৎসর্গ ও সপিণ্ডনাদি ঊর্দ্ধ দৈহিক কর্ম্ম করিলে প্রেতত্ব পরিহার হয় এবং স্বীয় কর্ম্মানুরূপ যোনি প্রাপ্ত হয়।

পরলৌকিক শুভাশুভ কেবল স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, দেহান্তে অন্য কর্ত্তৃক কৃতকর্ম্মের ফলে পরলৌকিক শুভাশুভ

ঘটনা হওয়া অসম্ভব। যাহার ঊর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য হয়, তাহার কি প্রেতত্ব দূর হইবে না?

ঊর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য পুত্রের কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার মাত্র; সুতরাং বহু প্রাচীন কাল হইতে হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উহাতে পরলোকগত জীবের কতদূর শুভাশুভ ঘটনা হয়, তাহা কে বলিতে পারে?

কেহ বলেন মনুষ্য যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান ও জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করেন, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন।

যথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি
নরোঽপরাণি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

ভগবদ্গীতা।

আধুনিক পণ্ডিতেরা পুনর্জ্জন্ম ই Transmigration of soul স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যেমন ঘড়ি দীর্ঘকাল ব্যবহার হইতে হইতে উহার কল জীর্ণ এবং শিথিল হইয়া গেলে, অথবা কারণ বশতঃ কলে কোন বিপর্য্যয় ঘটিলে ঘড়ি বন্ধ হইয়া

যায়, আর চলে না, তদ্রূপ জীবের দেহ জীর্ণ ও শিথিল হইলে অথবা কারণ বশত কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে দেহ নষ্ট হয়। পাপ পুণ্যের ধর্ম্ম অধর্ম্মের ফলাফল কেবল শাসন মাত্র; ছেলেকে জুজুর ভয় দেখাইয়া গর্হিত কর্ম্ম না করিতে দেওয়া।

মুসলমানেরা কহেন দেহান্ত পর বিচারকাল পর্য্যন্ত জীবাত্মা যে কোন স্থানে হউক অপেক্ষা করেন, বিচারকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ বিচারকর্ত্তা সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিয়োগ মত শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হন।

যাহাই হউক, যদি ভৌতিক দেহনাশে আত্মার নাশ না হয়, যদি আত্মা নিত্য হন, তবে সেই চিত্ত মোহিনী প্রণয়িনীর সহিত আমার পুণর্ম্মিলন হইবে। দশদিন পরে হউক, দশ বৎসর পরে হউক, কল্পা-ন্তেই হউক, আর প্রলয় কালেই হউক, অবশ্যই তাঁহার সহিত আবার মিলন হইবে, তখন কত আহ্লাদে, কত সুখে, কত আদরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রেমালিঙ্গন করিব; দগ্ধ হৃদয় খুলিয়া দেখাইব, মর্ম্মান্তিক মনবেদনার পরিচয় দিব, কত সুখের হাসি হাসিব, আবার হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ব

বিরহ স্মরণ করিয়া কাঁদিব, তখন তাহার বিচ্ছেদে কত কাঁদিয়াছি,তাহার পরিচয় দিব,কত দুঃসহ হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি কহিব, কত মর্ম্ম ভেদী অসহ্য দুঃখ সহ্য করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছি দেখাইব, আবার তাঁহার সুধাময় প্রেম ব্যঞ্জক শান্তনা বাক্যে শ্রবণ যুড়াইব, তাঁহার সলজ্জিত প্রেমময় মৃদু মধুর হাসিপূর্ণ চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করিব, তাঁহার সুকোমল অঙ্গস্পর্শে বিরহানল দগ্ধ শরীর শীতল করিব, তখন তাঁহার সহবাসে চির বিরহ পলায়ন করিবে। গললগ্ন কৃতবাসে তাহার চরণ ধরিয়া কহিব,প্রিয়ে ! প্রাণাধিকে ! আর তুমি আমাকে ছাড়িয়া যেও না, আর আমাকে কৃতান্তধিক বিচ্ছেদ অগ্নিতে দগ্ধ করিও না !!! তখন তিনিও প্রেমপূর্ণ মৃদু হাসি হাসিয়া আমার হস্ত ধরিবেন এবং আমাকে হৃদয়ে যত্ন পূর্ব্বক ধারণ করিয়া কহিবেন, " প্রাণাধিক ! প্রাণবল্লভ ! আমি ইচ্ছাক্রমে তোমাকে ছাড়িয়া আসি নাই এবং তোমার বিরহে তোমা হইতে ন্যূন যন্ত্রণা ভোগ করি নাই" । তখন উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনন্ত সুখ সাগরে সন্তরণ করিব

হায়! কতদিনে সে সুখের দিন আসিবে!!!

একি! আমি কি এত দিনে পাগল হইলাম!

শেষে অদৃষ্টে কি এই ছিল!!!

না, এ পাগলামি নহে, এ প্রেম ও ভালবাসার পরিণাম। তাই বলি ভালবাসা সুখ ও দুঃখের এক মাত্র কারণ এবং সংসার উহাদের নিত্য ক্রীড় স্থান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

তাই বলি, এই সংসারের পরম রমণীয় নয়ন-তৃপ্তিকর লোভ উদ্দীপক সৌন্দর্য্যে আর ভুলিব না, আর পত্নীপাশে বন্দী হইব না, আর ভালবাসাকে অন্তরে স্থান দিয়া হৃদ্‌পিণ্ড দগ্ধ করিব না, যাহা হইবার হইয়াছে আর কেন?

কিন্তু মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কিছুই নহে, যাহা হইবার অবশ্যই হইবে, কিছুতেই নিবারণ হইবে না।

যথা

যদ্দণ্ডে পতিতং বিন্দুং মাতৃগর্ভে নিয়োজিতং।
তদ্দণ্ডে লিখিতো ধাতা কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভম্।

লিঙ্গপুরাণ।

তবে উন্মাদের ন্যায় এত বাগাড়ম্বর কেন?

ভালবাসা। ভালবাসা।। কেবল ভালবাসা।।

গ্রন্থঃ সমাপ্তোঽয়ং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হলো ভালবাসা কি যন্ত্রণা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন, কেউ কারে ভালবাসে না॥